এভাবে তো শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাবে না

লালনের একটা গান এরকম: 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা! বেদে নাই যার রূপরেখা ওরে, বেদে নাই যার...'। অনেক কাঠখড়ি পোড়ানোর পরই ধান খাবারের উপযুক্ত হয়। কোনো কিছুই সামান্যে পাওয়া যায় না। এদেশের শিক্ষার গুণগত মান যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যে পর্যায়ে নেমে গেছে, এখান থেকে সব শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ন্যূনতম শিক্ষামানের ব্যবস্থা করে মোটামুটি সমপর্যায়ে আনার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। একটা দশতলা বিল্ডিংকে ভেঙে বস্তির সমকক্ষ না বানিয়ে বস্তিটাকেই দশতলার কাছাকাছি উচ্চতায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে শিক্ষার এ পর্যায় থেকে অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী, এ বোধ আমাদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও করণীয় কিছু বিষয় নিয়ে দুটো নিবন্ধ কয়েকদিনের ব্যবধানে এ পত্রিকাতেই লিখেছি। সে-সাথে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়েও আলাদাভাবে লিখেছি। জানিনা, বিষয়টা নিয়ে কেউ কিছু ভাবছেন কী না। লিখতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে জায়গা সংকুলানের অভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে কিছু 'বারান্তরে বলা'র ইচ্ছে পোষণ করি। আজ সেই 'বারান্তরে বলা' কথার কয়েকটা বলি।

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে যে, তাদের শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞানটাও নেই, যা তাদের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির লেখাপড়ার মধ্যে জানা উচিত ছিল। বেশ কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও প্রায় তাই। শিক্ষার ভিত্তিমূল খুবই খারাপ। তাদেরকে যদি উন্নত দেশের সিলেবাসের সাথে তাল মিলিয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা হয়, মান বজায় রাখা নিশ্চিতভাবে কঠিন হয়। বাস্তবতা হলো: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ মালিক পক্ষ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। তাই ভর্তি হতে আগ্রহী প্রত্যেককেই ভর্তি করে নেয়। শিক্ষকরাও নামমাত্র বেতনে কাজ করে 'কর্তা ইচ্ছে কর্ম' করে খেয়ে-পরে কায়ক্লেশে কোনোভাবে টিকে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বেশি– কথাটাও আদৌ ঠিক না। কোথাও কোথাও খেয়ে-পরে টিকে থাকার মতো। প্রায় জায়গাতেই বঞ্চনার শিকার হতে হয়। লেখাপড়াও মূলত হয় না, কারণ ছাত্রছাত্রীরাও লেখাপড়া করতে চাই না; করার যোগ্যতাও নেই, আগ্রহও নেই। হাতে গুনে ব্যতিক্রম কয়েকটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে জানি। ব্যতিক্রম দিয়ে মান যাচাই করা ঠিক নয়। এ সংখ্যা মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা দশ ভাগেরও কম। সেখানে কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ভর্তি হয় এটা ঠিক। ইনফ্লেটেড গ্রেডিং করার পরেও অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের গ্রেড খুবই খারাপ; পাশ করেনি, পাশ করানো হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতে চায় না বলে কিছু ভালো ছাত্রছাত্রীও লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়। এদেশের শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে শিক্ষা প্রদানে আপোশ করতে হয়। তারপরেও বার বার ফেল করে। অবশেষে শিক্ষক কোনো গত্যন্তর না দেখে পাশ করিয়ে দেওয়ার মওকা খোঁজেন। এ পরিস্থিতিতে মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবার প্রশ্ন অবান্তর। শিক্ষাদানের তুলনায় ছাত্রছাত্রী পাশ করলো, না ফেল করলো, আমরা এ বিষয়টাকেই বড় করে দেখি। কেন শিক্ষায় অনীহ হয়, কেন ফল খারাপ করে, এটা তলিয়ে দেখি না। গত লেখাতে লিখেছিলাম, 'অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে'। এদেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সংস্কৃতি নেই, সামাজিক শিক্ষা নেই। আমরা মুখ-সর্বস্ব বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় বিশ্বাসী। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়েও কষ্টদায়ক সত্য কথাটা এই যে, নীতি-নৈতিকতাহীন চাটুকার ও লেফাফাদুরস্ত

অবগুণ্ঠিত দুরাচার, মিথ্যাচার ও স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত অধঃপতিত, অপকৃষ্ট রাজনৈতিক ধারা আমাদের দেশকে ক্রমশই সর্বশান্ত ও দেউলিয়া করে ছাড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। আমরা সত্য প্রকাশে দারুণ অনীহ। বড্ড আত্মমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। আমরা আমাদের অস্তিত্ব বিলীনের পথে চলে যাচ্ছি। এই আত্মচিন্তাও আমাদের নেই। এতে মুখোশধারী কপটাচাররাই সার্থক হচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকাটা পড়লেই বোঝা যায়, উন্নতির প্রতিটা সেক্টরে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এর মধ্যে শিক্ষা সেক্টরটা অন্যতম। কারণ কোনো জাতি ধ্বংস হতে গেলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বেহায়াপনা, আইনহীনতা, অবিচার, নিকৃষ্টতা ও দুর্নীতি তার মূলে থাকে। শিক্ষা সেক্টর দিয়েই তা শুরু হয়। অল্প কয়েকটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটা নির্দিষ্ট মান মেনে চলে। সে মানেরও উন্নতির যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আবার একই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের লেখাপড়ার মান সমান না। সেখানেও রকমফের আছে। মান মেনে চলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য।

কোনো ছাত্রছাত্রীর আন্ডাগ্রাজুয়েট পর্যায়ে পড়ার যোগ্যতা আছে কীনা, কখনোই বিবেচনা করে দেখি না। ইনপুট ভালো না হলে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট যতই করা হোক না কেন, আউটপুট ভালো পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু প্রসেস ডেভেলপমেন্ট দিয়ে সব ইনপুট ভালো আউটপুটে পরিণত করাও যায় না। 'গারবেজ ইন, গারবেজ আউট' কথাটা তো এমনি হয়নি। আবার প্রসেস ডেভেলপমেন্ট নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রসেসেরও ভূতে ধরেছে। তাহলে ভালো আউটপুট আসবে কোত্থেকে? বিষয়টা কর্তৃপক্ষ আদৌ বিবেচনায় আনতে চান না। বাজারে বিভিন্ন জেলাতে বিগত এক যুগের একটু বেশি সময় ধরে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, লেখাপড়ার মান সেখানেও বেশ খারাপ। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা নেওয়া পরিস্থিতিকে আরোও নাজুক, জটিল ও ঘোলাটে করে ফেলেছে। অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে সব কুঁজোই টাকার জোরে চিত হয়ে শুতে চায়। এক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকও নাছোড়বান্দা। সন্তানকে এমএ পাশ করাতে চায়। কারিগরি শিক্ষায় অনেকেই যেতে চায় না। সেখানে গেলেও না-শিখে পাশ সার্টিফিকেট। হাতেকলমে-ব্যবহারিক শিক্ষা নেই। পানি যখন নদীতে বাড়ে, খাল-বিলেও বাড়ে। একই দশা সর্বত্র।

আমার নিজস্ব একটা বুঝ এরকম: একজন চাষী চাষ কাজে উন্নতি করতে হলে তার লাঙ্গল ও এক জোড়া গরু অন্তত মজবুত থাকতে হবে। একজন রিক্সাচালকের ক্ষেত্রেও তাই, নামমাত্র ভাঙা রিক্সা হলে দুর্গতির শেষ থাকে না। একজন যোদ্ধার হাতিয়ারটা অন্তত মজবুত থাকতে হবে। একজন মানুষ উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদ্যা খাটিয়ে জীবন নির্বাহ করতে গেলে তার লেখাপড়ায় ধার যেমন থাকতে হবে, তেমনি জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলিকেন্দ্রিক শিক্ষা থাকতেই হবে। বানু মোল্লা শায়েরি লিখেছিলেন, 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি'। আমরা বর্তমানে সে অবস্থায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা এইট পাশের যোগ্যতাই অর্জন করি না, অথচ কোনো বিষয়ে অনার্স পড়তে চাই। দুঃখ এখানে যে, আমার মতো হাজার হাজার শিক্ষক তাদের পড়ায়। পাশ নম্বর দিতে হয়। মাঝে-মধ্যে শিক্ষকদেরকে সেমিনার-ওয়ার্কশপ করে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর মহামূল্যবান প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অথচ ছাত্রছাত্রীদের মনে শিক্ষার আগ্রহ ও ইচ্ছা জন্মানোর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিংবা ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিকল্পে কোনো হোমিও ওষুধ দু-এক ডোজ খাইয়েছেন কী না তাও জানা নেই। শুধু এটুকু জানা আছে যে, প্রতিটা ছাত্রছাত্রী মোবাইল ফোনের যত অপব্যবহার আছে, সবটাই রপ্ত করেছে। একজন ছাত্রছাত্রী ক্লাসে না এলে, বই না পড়লে, শেখার প্রতি আগ্রহী না হলে শিক্ষকের অসহায় হওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের

ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। অথচ ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'ঘরে-বাইরে এক মন, তবেই কর কেষ্ট ভজন' (শ্রীকৃষ্ণকে কেষ্ট নামে ডাকা হয়)। আমরা ছাত্রছাত্রীদের মন-মানসিকতাকে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা, পরিবেশকে শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা একবারও ভাবিনে।

শিক্ষা একটা অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। আমরা এটা ভুলে যাই। আমরা যোগ-বিয়োগ না শিখে গুণ-ভাগ করা শেখাতে চাই। বিদ্যুতের ভোল্টেজ যত বেশিই থাক না কেন, মাঝপথে তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাটন যত ভালোভাবেই টিপাটিপি করি না কেন, বাতি জ্বালানো কোনোক্রমেই সম্ভবপর হয় না। অথচ এদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমরা তা বারবার করি। আমারা মাথা ছেঁটে টুপিতে লাগায়, মাথার জন্য উপযুক্ত করে টুপি তৈরি করি না। অন্য আরেকটা অসুবিধাও আমাদের আছে। এটা আমাদের জাতীয় ব্যামো। আমরা কঠিন রোগের প্রতিকারে এন্টিবায়টিক ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবিতা জেনেও, তা ব্যবহার না করে উপর-উপর মলমের প্রলেপ দিয়ে রোগ নিরাময়ের বৃথা চেষ্টা করি। ফলে ফলপ্রসূ তেমন কিছু হয় না। এভাবে দিন পার হয়ে যায়, বছর পার হতে হতে বর্তমান এ দশা দাঁড়িয়েছে।

মোটামুটি তেতাল্লিশ বছর ধরে এ পেশাতে আছি। আমি কোনো কিছুকে নিছক তাকিয়ে দেখি না। মন দিয়ে উপলব্ধি করি, কখনোবা পর্যবেক্ষণ করি; এটা আমার স্বভাব ও প্রকৃতিও বলা যায়। অন্য কোনো কোনো দেশেও লেখাপড়া ও পড়ানোর সুযোগ আমি পেয়েছি। সে দেশের ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি। তুলনা করলে আমাদের দেশের গড় ছাত্রছাত্রীদের মেধা অনেক ভালো। আমরা সে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছি না। তাদেরকে সুস্থ ধারায় পরিচালিত করতে পারছি না। তাদেরকে খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে, কখনো পথভ্রষ্ট-গুরুমন্ত্রে দীক্ষা ও সবক দিয়ে বিপথগামী করছি; শিক্ষাহারা, বেকার, বিকৃত চিন্তা ও নীতিহীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলছি। তাদেরকে শোষণ করছি। এসব অসংখ্য বিষয়েরও আমি চাক্ষুস সাক্ষী। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সবচে বড় অসুবিধা হলো: বয়সের তুলনায় তারা অপরিপক্ক ও হালকা স্বভাবের। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভালো পোশাক পরে একটা দামি মোবাইল সেট হাতে নিয়ে নিজেকে ও চেহারাকে সাজাতে চায়, ঘর সাজাতে চায়; নিজের জীবনকে সাজানোর কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। সময়ের কাজ সময়ে করে না। মূল্যবান সময়কে বিফলে নষ্ট করে। লালন গেয়েছেন, 'অসময়ে কৃষি করে, মিছামিছি খেটে মরে, গাছ যদিও হয় বীজের জোরে, ফল ধরে না, তাতে ফল ধরে না'।

এ লেখার শেষে একটা নোক্তা যোগ করি। ইউজিসি বিষয়টা বিবেচনা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য কতরকম ভর্তি পদ্ধতিই তো আমরা দেখলাম। শেষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে এসে থেমেছে। ইউজিসিও আবার অন্যরকম গুচ্ছ পদ্ধতির কথা ভাবছে বলেও শুনেছি। অন্য দেশে জিএমএটি, জিআরই, টোফেল, আইইএলটিএস কতকিছুরই প্রয়োজন হয়। তারা অনেকদিন ধরে বাজারে এসব পরীক্ষার একটা মানও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউজিসি এমন একটা উদ্যোগ নিতে পারে না কেন! দফায় দফায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বার বার ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে এইসএসসি পরীক্ষার পর বিজ্ঞান বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ ও মানবিক বিভাগের জন্য আলাদাভাবে তিনটি পরীক্ষা ইউজিসির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাটা ব্যাপক ও মানসম্মত হবে। প্রয়োজনে চার ঘণ্টাব্যাপীও হতে পারে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য হবে। একবার একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলে সে রেজাল্ট পর পর দুবছর ব্যবহার করতে পারবে। এ রেজাল্টের

ভিত্তিতে সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হবে। জিপিএ-তে একটা কাট-অফ পয়েন্ট থাকবে। তার নীচে কেউ অর্জন করলে কোনো সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিকেলে ভর্তির অযোগ্য হবে। সব ছাত্রছাত্রীকে টাকার জোরে উচ্চশিক্ষায় যাবার প্রয়োজন নেই। 'দেবে আর নেবে মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে' এই তত্ত্ব বাদ দেবার সময় চলে এসেছে। যে কোনো জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবে। উদ্যোগটা ইউজিসিকেই নিতে হবে, মানও বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার মান বাড়ানো ও নিয়ন্ত্রণের আরো কিছু পথও আছে। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার বিষয় নিয়েও কিছু পরামর্শ আছে। বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(২১ আগষ্ট ২০২৩ দৈনিক যুগান্তরের উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।